



শিক্ষক-ছাত্র অনুপাত, বাস্তবতা ও উত্তরণে কৌশল

লেখক: অধ্যাপক ড. কাজী আ. মান্নান | প্রকাশিত: 10 July 2026, 11:53 PM | বিভাগ: এইচআরএম



বিশ্বায়নের যুগে উচ্চশিক্ষা কেবল একটি দশেরে অভ্যন্তরীণ বিষয় নয়; বরং এটি আন্তর্জাতিকি প্রতিযোগিতা, জ্ঞান-অর্থনীতি, গবেষণা সক্ষমতা এবং মানবসম্পদ উন্নয়নের অন্যতম সূচক। বর্তমানে বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে মান নির্ধারণে যে কয়েকটি আন্তর্জাতিকি র‍্যাংকিং প্রতিষ্ঠান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে, তার মধ্যে অন্যতম হলো কডিএস র‍্যাংকিং। কডিএস বিশ্ববিদ্যালয় র‍্যাংকিং উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা, গবেষণা, আন্তর্জাতিকীকরণ, কর্মসংস্থান সক্ষমতা এবং একাডেমিকি খ্যাতিসহ বিভিন্ন সূচকে ভিত্তিতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অবস্থান নির্ধারণ করে থাকে।

এই সূচকগুলোর মধ্যে “ফ্যাকাল্টি-স্টুডেন্ট রশেও” বা শিক্ষক-ছাত্র অনুপাত একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মানদণ্ড। কারণ, একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকের তুলনায় শিক্ষার্থীর সংখ্যা যত কম হয়, তত বেশি ব্যক্তিকেন্দ্রিক শিক্ষা, তত্ত্বাবধান, গবেষণা সহায়তা এবং মানসম্মত শিক্ষাদান নিশ্চিতি করা সম্ভব হয়। উন্নত বিশ্বে শীর্ষ বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এই সূচকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকে। বপিরাতে বাংলাদেশের অধিকাংশ সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক সংকট, অতিরিক্ত শিক্ষার্থী ভর্তি, অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতা এবং নীতগিত দুর্বলতার কারণে শিক্ষক-ছাত্র অনুপাত উদ্বেগজনক অবস্থায় রয়েছে।

বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষার সম্প্রসারণ গত দুই দশকে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পলেও গুণগত মান উন্নয়নের প্রশ্নে এখনও বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান। বিশেষত শিক্ষক-ছাত্র অনুপাতের ভারসাম্যহীনতা শিক্ষার মান, গবেষণার পরিশে, শিক্ষার্থীদের দক্ষতা অর্জন এবং আন্তর্জাতিক র্যাংকিংয়ে বাংলাদেশের অবস্থানকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করছে। এই প্রবন্ধে কডিএস সূচকের আলোকে শিক্ষক-ছাত্র অনুপাতের গুরুত্ব, বাংলাদেশের বর্তমান বাস্তবতা, এর বহুমাত্রিক প্রভাব এবং উত্তরণের কার্যকর কৌশল বিশদভাবে আলোচনা করা হবে।

কডিএস র্যাংকিংয়ে শিক্ষক-ছাত্র অনুপাতকে শিক্ষার মানের একটি কার্যকর সূচক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কারণ এটি সরাসরি শিক্ষার্থীদের শেখার অভিজ্ঞতার সাথে সম্পর্কযুক্ত। ছোট ব্যাচভিত্তিক ক্লাস শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করার সুযোগ বৃদ্ধি করে, সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনা গড়ে তোলে এবং ইন্টার-অ্যাকটিভ শিক্ষা নিশ্চিতি করে। একইসাথে শিক্ষকেরা শিক্ষার্থীদের দুর্বলতা চিহ্নিত করে ব্যক্তিগতভাবে সহায়তা করতে পারেন। এর বপিরাতে বৃহৎ ক্লাসরুমে শিক্ষার্থীদের সাথে শিক্ষকের যোগাযোগ সীমিত হয়ে যায়, মূল্যায়নের মান কমে যায় এবং গবেষণামুখী শিক্ষা ব্যাহত হয়। বর্তমানে বিশ্বব্যাপী উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থায় শূন্য ডিগ্রি প্রদান নয়, বরং দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি, গবেষণা উৎপাদন এবং উদ্ভাবনী সক্ষমতা বৃদ্ধিকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। এ কারণে শিক্ষক-ছাত্র অনুপাত একটি কৌশলগত একাডেমিক সূচকে পরিণত হয়েছে। উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য এই সূচক আরও গুরুত্বপূর্ণ, কারণ উচ্চশিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিতি করতে না পারলে বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা কঠিন হয়ে পড়বে। বাংলাদেশের মতো দেশে কডিএস সূচকে এই ধারণা উচ্চশিক্ষা সংস্কারের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা প্রদান করতে পারে।

বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষার বিস্তার গত দুই দশকে সরকারি ও বেসরকারি উভয় খাতেই বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা

দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়ায় উচ্চশিক্ষায় প্রবশোধিকারের সুযোগ অনেকে বড়েছে। কিন্তু এই সম্প্রসারণের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে শিক্ষক নিয়োগ, গবেষণা অবকাঠামো এবং একাডেমিক সক্ষমতা উন্নয়ন না হওয়ায় শিক্ষক-ছাত্র অনুপাত একটি বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দিয়েছে। দেশের অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা দ্রুত বাড়লেও সেই অনুপাতে যোগ্য ও পূর্ণকালীন শিক্ষক নিয়োগ হয়নি। ফলে আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের তুলনায় বাংলাদেশের অনেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক-ছাত্র অনুপাত উদ্বেগজনক অবস্থায় রয়েছে।

সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এই সংকট তুলনামূলকভাবে বেশি দৃশ্যমান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এর মতো বৃহৎ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার্থীর চাপ অত্যন্ত বেশি। অনেকে বিভাগে একটি শ্রুণেকিক্ষে শতধিক শিক্ষার্থীকে পাঠদান করতে হয়, যা কার্যকর শিক্ষাদান ও শিক্ষার্থী তত্ত্বাবধানকে কঠিন করে তোলে। একজন শিক্ষককে একাধিক কোর্স পরিচালনা, পরীক্ষা মূল্যায়ন, প্রশাসনিক দায়িত্ব এবং গবেষণাকর্ম একসাথে সামলাতে হয়। এর ফলে গবেষণার সময় কম যায় এবং শিক্ষার্থীদের জন্য প্রয়োজনীয় একাডেমিক সহায়তা সীমিত হয়ে পড়ে। বিশেষত গবেষণাভিত্তিক শিক্ষা, থিসিস তত্ত্বাবধান এবং ব্যক্তিকেন্দ্রিক মেন্টরিং এই পরিস্থিতিতে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও একই ধরনের সমস্যা বিভিন্ন মাত্রায় বিদ্যমান। কিছু শীর্ষ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আন্তর্জাতিক মান বজায় রাখার চেষ্টা করলেও অনেকে প্রতিষ্ঠান অতিরিক্ত শিক্ষার্থী ভর্তি করে আর্থিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে চায়। ফলে সেখানে পূর্ণকালীন শিক্ষকের পরিবর্তে খণ্ডকালীন শিক্ষকের ওপর নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পায়। এতে শিক্ষার্থীরা দীর্ঘময়োদী একাডেমিক দিকনির্দেশনা থেকে বঞ্চিত হয়। একইসাথে গবেষণা কার্যক্রমও সীমিত থাকে। বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থায় গবেষণা সংস্কৃতির দুর্বলতা, ডক্টরেটধারী শিক্ষকের াল্পতা, আন্তর্জাতিক মানের গবেষণা সুবিশার অভাব এবং বদিশেমুখী মধোপ্রবাহ এই সংকটকে আরও জটিল করেছে। এই বাস্তবতা শুধু শিক্ষার গুণগত মানকেই প্রভাবিত করেছে না; বরং আন্তর্জাতিক র্যাংকিংয়েও বাংলাদেশের অবস্থানকে দুর্বল করে তুলছে। কডিএস র্যাংকিংয়ে শিক্ষক-ছাত্র অনুপাত একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক হওয়ায় বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এই ক্ষেত্রে পছিয়ে পড়ছে। এর দীর্ঘময়োদী প্রভাব কর্মসংস্থান, গবেষণা উৎপাদন, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এবং দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়নের ওপরও পড়ছে। তাই শিক্ষক-ছাত্র অনুপাতের বর্তমান সংকটকে শুধু প্রশাসনিক সমস্যা হিসেবে নয়, বরং জাতীয় উন্নয়ন ও বৈশ্বিক প্রতিযোগিতার সাথে সম্পর্কিত একটি কৌশলগত চ্যালেঞ্জ হিসেবে বিবেচনা করা প্রয়োজন।

বাংলাদেশে শিক্ষক সংকটের অন্যতম প্রধান কারণ হলো দীর্ঘময়োদ্য মানবসম্পদ পরিকল্পনার অভাব। নতুন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এবং নতুন বিভাগ চালুর ক্ষেত্রে অনেকে সময় পর্যাপ্ত শিক্ষক সরবরাহ, গবেষণা সক্ষমতা কিংবা অবকাঠামোগত প্রস্তুতির বিষয়টি যথাযথভাবে বিবেচনা করা হয় না। ফলস্বরূপ একটি বিশ্ববিদ্যালয় আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যক্রম শুরু করলেও সেখানে পর্যাপ্ত সংখ্যক পূর্ণকালীন শিক্ষক থাকে না। অনেকে বিভাগে সীমিতসংখ্যক শিক্ষককে অতিরিক্ত কোর্স পরিচালনা করতে হয়, যা শিক্ষার মানকে প্রভাবিত করে।

গবেষণা পরিবেশে সীমাবদ্ধতাও শিক্ষক সংকটের একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ। বিশ্বের উন্নত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে গবেষণার জন্য উন্নত ল্যাবরেটরি, পর্যাপ্ত অনুদান, আন্তর্জাতিক জার্নালে প্রবিশোধকির এবং গবেষণা সহায়ক পরিবেশে বিদ্যমান থাকলেও বাংলাদেশে অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ে এসব সুযোগ সীমিত। ফলে অনেকে মধ্যবী তরুণ গবেষক বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকতায় আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন। আবার যারা উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার জন্য বিদেশে যান, তাঁদের একটি অংশ উন্নত সুযোগ-সুবিধার কারণে দেশে ফিরে আসেন না। এই “ব্রাইন ড্রাইন” বা মধ্যপ্রবাহ দেশে উচ্চশিক্ষা খাতে দীর্ঘময়োদ্য সংকট তৈরি করেছে।

একইসাথে শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে অস্বচ্ছতা, প্রশাসনিক জটিলতা এবং রাজনৈতিক প্রভাবও সংকটকে গভীর করেছে। অনেকে সময় মধ্য, গবেষণা দক্ষতা ও আন্তর্জাতিক প্রকাশনার পরিবর্তে অন্যান্য বিষয় প্রাধান্য পাওয়ার অভিযোগ ওঠে। এতে প্রকৃত মধ্যবীরা নরুৎসাহিত হন এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে প্রতিযোগিতামূলক একাডেমিক পরিবেশে গড়ে ওঠে না। শিক্ষকতার পশোগত মর্যাদা থাকলেও অনেকে ক্ষেত্রে বতেন কাঠামো, গবেষণা অনুদান এবং পশোগত উন্নয়নের সুযোগ আন্তর্জাতিক মানের তুলনায় সীমিত হওয়ায় মধ্যবী শিক্ষার্থীরা কর্পোরেটে খাত বা বিদেশমুখী পশোর দিকে ঝুঁক পড়েন।

অতিরিক্ত শিক্ষার্থী ভর্তি নীতিও শিক্ষক সংকটকে তীব্র করে তুলছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অনেকেই অবকাঠামো ও শিক্ষক সক্ষমতা বিবেচনা না করেই বপুলসংখ্যক শিক্ষার্থী ভর্তি করেছে। এর ফলে সীমিতসংখ্যক শিক্ষককে অতিরিক্ত শিক্ষার্থী সামলাতে হচ্ছে। বিশেষ করে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষককে ওপর পাঠদান, পরীক্ষা মূল্যায়ন, প্রশাসনিক দায়িত্ব এবং গবেষণার বহুমুখী চাপ সৃষ্টি হয়। অন্যদিকে অনেকে বসেরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে খণ্ডকালীন শিক্ষককে ওপর অতিরিক্ত নরিভরশীলতা দীর্ঘময়োদ্য একাডেমিক উন্নয়নকে সীমিত করে। সব মলিয়ে শিক্ষক সংকট

বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থার একটি কাঠামোগত সমস্যা, যার সাথে পরিকল্পনা, অর্থায়ন, গবেষণা সংস্কৃতি, নিয়োগ নীতি এবং জাতীয় শিক্ষানীতির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। এই সংকট সমাধানে সমন্বতি ও দীর্ঘময়োদীপদক্বে গ্ৰহণ ছাড়া আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার সম্ভব হবে না।

অতিরিক্ত শিক্ষার্থীসংখ্যা শিক্ষার মানকে সরাসরি ক্বেতগ্ৰিস্ত করে। একটি শ্ৰণেকিক্বে যখন শিক্ষার্থীর সংখ্যা অত্যধিক হয়, তখন শিক্ষক প্ৰত্যেকে শিক্ষার্থীর প্ৰতিপ্ৰয়োজনীয় মনোযোগ দিতে পারেনা। ফলে পাঠদান অনকোংশে একমুখী বক্তৃতাভিত্তিক হয়ে পড়ে এবং শিক্ষার্থীদের অংশগ্ৰহণমূলক শিক্ষা বাধাগ্ৰস্ত হয়। সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনা, শ্ৰণেকিক্বে আলোচনা এবং সমস্যা সমাধানভিত্তিক শিক্ষার প্ৰবিশে দুর্বল হয়ে পড়ে। শিক্ষার্থীরা অনেক সময় নিজদেরে একাডেমিক দুর্বলতা নিয়ে শিক্ষকের সাথে ব্বেক্তগিতভাবে আলোচনা করার সুযোগও পায় না।

শিক্ষক-ছাত্র অনুপাতের ভারসাম্যহীনতা গবেষণা কার্যক্ৰমকে নতেবিচকভাবে প্ৰভাবিত করে। একজন শিক্ষককে যখন অতিরিক্ত কেরস প্ৰচালনা, প্ৰীক্ষা মূল্যায়ন এবং প্ৰশাসনিক দায়িত্ব পালন করতে হয়, তখন গবেষণার জন্য প্ৰাপ্ত সময় অবশিষ্ট থাকে না। ফলে আন্তর্জাতিক মানের গবেষণা প্ৰকাশনা কমে যায় এবং বশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা সক্ষমতা দুর্বল হয়ে পড়ে। বিশেষত কডিএস এর মতো আন্তর্জাতিক র্যাংকিংয়ে গবেষণা এবং একাডেমিক সুনামের গুরুত্ব বেশি হওয়ায় এই সমস্যা বাংলাদেশে বশ্ববিদ্যালয়গুলোর বশ্বিক অবস্থানকে ক্বেতগ্ৰিস্ত করেছে। একইসাথে মূল্যায়ন পদ্ধতির গুণগত মানও ক্বেতগ্ৰিস্ত হয়। বপুল সংখ্যক শিক্ষার্থীর খাতা, অ্যাসাইনমেন্ট এবং গবেষণাপত্ৰ মূল্যায়নের ক্বেত্রে শিক্ষকেরা প্ৰাপ্ত সময় দিতে পারেনা। এর ফলে মূল্যায়নের নর্ভুলতা ও মান নিয়ে প্ৰশ্ন তৈরি হয়। অনেক সময় শিক্ষার্থীরা যথায় ফডিব্যাক থেকে বঞ্চিত হয়, যা তাঁদেরে একাডেমিক উন্নয়নকে সীমিত করে। গবেষণাভিত্তিক থিসিস বা প্ৰজেক্ট তত্ত্বাবধানও এই প্ৰসিথিতিতে দুর্বল হয়ে পড়ে।

শিক্ষক-ছাত্র অনুপাতের নতেবিচক প্ৰভাব শিক্ষার্থীদের মানসিক ও পশোগত উন্নয়নেও পড়ে। অতিরিক্ত শিক্ষার্থী সংখ্যার কারণে ক্যারিয়ার কাউন্সেলিং, মেন্টরিং এবং দক্বেতা উন্নয়নমূলক কার্যক্ৰম সীমিত হয়ে যায়। ফলে শিক্ষার্থীরা আন্তর্জাতিক প্ৰতিযোগিতায় প্ৰয়োজনীয় দক্বেতা অর্জনে পছিয়ে পড়ে। অন্যদিকে শিক্ষকদেরে ওপর অতিরিক্ত কাজের চাপ মানসিক ক্লান্তি ও পশোগত হতাশা তৈরি করে, যা দীর্ঘময়োদে শিক্ষার গুণগত মানকে আরও ক্বেতগ্ৰিস্ত করে। এই প্ৰসিথিতি আন্তর্জাতিক সহযোগিতা, বদেশি শিক্ষার্থী আকর্ষণ এবং গবেষণা অর্থায়নের ক্বেত্রেও নতেবিচক

প্রভাব ফেলে। বশির্মানরে বশির্বদিয়ালয়গুলো সাধারণত শকিষ্মারথীকনেদ্রকি শকিষ্মা, গবষেণা সহায়তা এবং কার্যকর মনেটরিং ব্যবস্থাককে গুরুত্ব দিয়ে। বাংলাদেশে বশির্বদিয়ালয়গুলো যদি শকিষ্মক-ছাত্র অনুপাতরে ভারসাম্য উন্নয়ন করতে না পারে, তাহলে বশির্কি উচ্চশকিষ্মা প্রতযিোগতিয় পছিয়ি পড়ার ঝুঁকি আরও বাড়বে। তাই এই সমস্যাককে শুধুমাত্র প্রশাসনকি সীমাবদ্ধতা হিসিবে নয়, বরং জাতীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন ও জ্ঞানভিত্তিকি অর্থনীতি নির্মাণরে একটি মৌলকি চ্যালেঞ্জ হিসিবে বিচেনা করা প্রয়োজন।

বশির্রে উন্নত উচ্চশকিষ্মা ব্যবস্থাগুলোতে শকিষ্মক-ছাত্র অনুপাতকে শকিষ্মার গুণগত মানরে অন্যতম ভিত্তি হিসিবে বিচেনা করা হয়। অক্সফোর্ড বশির্বদিয়ালয়, স্ট্যানফোর্ড বশির্বদিয়ালয়, কংবো সঙিগাপুর জাতীয় বশির্বদিয়ালয় এর মতো বশির্বদিয়ালয়গুলোতে ছোট ব্যাচভিত্তিকি ক্লাস, গবষেণাভিত্তিকি শকিষ্মা, মনেটরিং ব্যবস্থা এবং শকিষ্মারথী-কনেদ্রকি পাঠদানকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। এসব প্রতযিষ্ঠানে শকিষ্মকরা কেবল পাঠদানই করেনে না; বরং গবষেণা, উদ্ভাবন এবং ব্যক্তিগত একাডেমিকি তত্ত্বাবধানও সক্রিয় ভূমকি পালন করেনে। একইসাথে উন্নত গবষেণাগার, পর্যাপ্ত অর্থায়ন এবং আন্তর্জাতকি সহযোগতি শকিষ্মক-ছাত্র ভারসাম্যকে কার্যকর রাখে। এশিয়ার অনকে দেশে, বশিষেত সঙিগাপুর, চীন ও দক্ষিণ কোরিয়া, উচ্চশকিষ্মায় দীর্ঘময়াদি বনিয়োগরে মাধ্যমে আন্তর্জাতকি র্যাংকিংয়ে দ্রুত অগ্রগতি অর্জন করেছে। বাংলাদেশে জন্য এসব অভিজ্ঞতা গুরুত্বপূর্ণ শকিষ্মা বহন করে। শুধু বশির্বদিয়ালয়রে সংখ্যা বৃদ্ধি নয়, বরং গবষেণা সক্ষমতা, দক্ষ শকিষ্মক নিয়োগ এবং শকিষ্মারথীকনেদ্রকি একাডেমিকি পরবিশে নিশ্চিতি করাই হওয়া উচিতি মূল লক্ষ্য। আন্তর্জাতকি বাস্তবতা প্রমাণ করে যে মানসম্মত উচ্চশকিষ্মা গড়ে তুলতে শকিষ্মক-ছাত্র অনুপাতরে ভারসাম্য রক্ষা অপরিহার্য।

বাংলাদেশে উচ্চশকিষ্মায় শকিষ্মক-ছাত্র অনুপাত উন্নয়নরে জন্য সমন্বতি ও দীর্ঘময়াদিকৌশল গ্রহণ প্রয়োজন। প্রথমত, জাতীয় পর্যায়ে বাস্তবসম্মত উচ্চশকিষ্মা পরকিল্পনা ত্বরিকরতে হবে, যখনে শকিষ্মারথী ভর্তি, শকিষ্মক নিয়োগ এবং গবষেণা উন্নয়নকে সমন্বতিভাবে বিচেনা করা হবে। দ্বিতীয়ত, শকিষ্মক নিয়োগে স্বচ্ছতা ও মধোভিত্তিকি মূল্যায়ন নিশ্চিতি করতে হবে, যাত্রে গবষেণামুখী ও দক্ষ শকিষ্মক তরৈি হয়। একইসাথে পিএইচডি স্কলারশপি, গবষেণা অনুদান এবং আন্তর্জাতকি প্রশকিষ্মণরে সুযোগ বৃদ্ধিকিরা প্রয়োজন।

আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর শকিষ্মা ব্যবস্থাও শকিষ্মকদরে ওপর চাপ কমাতে সহায়ক হতে পারে। অনলাইন

লার্নিং প্ল্যাটফর্ম, ডিজিটাল লাইব্রেরি এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক শিক্ষাসহায়ক প্রযুক্তি শিক্ষার মান উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে কেবল ডিগ্রি প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান নয়, বরং গবেষণা ও উদ্ভাবনের কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। একইসাথে শলি্পখাত ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সহযোগিতা বাড়ালে গবেষণা অর্থায়ন এবং বাস্তবমুখী দক্ষতা উন্নয়নে সুযোগ বৃদ্ধি পাবে। সর্বোপরি “সংখ্যাভিত্তিক সম্প্রসারণ” থেকে “মানভিত্তিক উন্নয়ন”-এর দিকে অগ্রসর হওয়াই হওয়া উচিত বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষা নীতির প্রধান কৌশল।

বাংলাদেশে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো উচ্চশিক্ষার সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেও শিক্ষক-ছাত্র অনুপাতের ভারসাম্য রক্ষায় এখনও নানা সীমাবদ্ধতা বিদ্যমান। অনেকে প্রতিষ্ঠান অতিরিক্ত শিক্ষার্থী ভর্তি করে আর্থিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিতি করতে চায়, ফলে পূর্ণকালীন শিক্ষকরা ঘাটতি তৈরি হয় এবং খণ্ডকালীন শিক্ষকরা ওপর নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পায়। এই পরিস্থিতি দীর্ঘমেয়াদি একাডেমিক তত্ত্বাবধান ও গবেষণা সংস্কৃতিকে দুর্বল করে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর উচিত গবেষণামুখী পূর্ণকালীন শিক্ষক নিয়োগ বৃদ্ধিকরা এবং শিক্ষকদের জন্য প্রশিক্ষণ, গবেষণা অনুদান ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার সুযোগ তৈরি করা। একইসাথে শিক্ষার্থীসংখ্যা নির্ধারণে অবকাঠামো ও শিক্ষক সক্ষমতাকে গুরুত্ব দিতে হবে। আধুনিক ল্যাবরেটরি, ডিজিটাল লাইব্রেরি এবং শিক্ষার্থী সহায়তা সেবা উন্নয়নও জরুরি। আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে যৌথ গবেষণা, শিক্ষক বিনিময় এবং একাডেমিক অংশীদারিত্ব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মানোন্নয়নে সহায়ক হতে পারে। কিছু বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ইতোমধ্যে আন্তর্জাতিক র‍্যাংকিংয়ে প্রবশে চেষ্টা করছে, যা ইতিবাচক দৃষ্টান্ত। তবে সামগ্রিকভাবে গুণগত শিক্ষা নিশ্চিতি করতে হলে বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তে গবেষণা, দক্ষতা উন্নয়ন এবং শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক একাডেমিক সংস্কৃতিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

আন্তর্জাতিক মানের গবেষণাগার, ডিজিটাল রসিোর্স এবং গবেষণা অনুদানের সীমাবদ্ধতা শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের গবেষণামুখী কার্যক্রমকে বাধাগ্রস্ত করে। এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় দ্রুত শিক্ষক নিয়োগ, বিভাগভিত্তিক জনবল পরিকল্পনা, প্রশাসনিক জটিলতা হ্রাস এবং গবেষণা সহায়তা বৃদ্ধি জরুরি। একইসাথে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনে স্বচ্ছতা ও একাডেমিক স্বাধীনতা নিশ্চিতি করা হলে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আন্তর্জাতিক মানোন্নয়নে আরও কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারবে।

বর্তমানে বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষা খাতে নানা সীমাবদ্ধতা থাকলেও সম্ভাবনার ক্ষেত্রও কম নয়। দেশে বিশাল তরুণ জনগোষ্ঠী, উচ্চশিক্ষার প্রতি ক্রমবর্ধমান আগ্রহ এবং প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষার

সম্প্রসারণ ভবিষ্যতের জন্য ইতিবাচক ভিত্তি তৈরি করেছে। যদি শিক্ষক-ছাত্র অনুপাত উন্নয়ন, গবেষণায়

বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সম্প্রসারণ করা যায়, তাহলে বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বৈশ্বিক র‍্যাংকিংয়ে আরও শক্তিশালী অবস্থান তৈরি করতে সক্ষম হবে। ইতোমধ্যে কিছু বিশ্ববিদ্যালয় আন্তর্জাতিক প্রকাশনা, গবেষণা এবং একাডেমিক কার্যক্রমে অগ্রগতি অর্জন করেছে, যা আশাব্যঞ্জক। কডিএস-এর মতো আন্তর্জাতিক সূচকে উন্নতি করতে হলে শুধু অবকাঠামো নয়, বরং গবেষণা সংস্কৃতি, দক্ষ শিক্ষক নিয়োগ এবং শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শিক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। একইসাথে বাদেশি শিক্ষার্থী আকর্ষণ, আন্তর্জাতিক গবেষণা অংশীদারিত্ব এবং শলিপ-একাডেমিয়া সহযোগিতা বাড়ানো প্রয়োজন। বাংলাদেশে যদি দীর্ঘময়াদি পরিকল্পনার মাধ্যমে উচ্চশিক্ষাকে জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতির চালকশক্তিতে রূপান্তর করতে পারে, তাহলে আগামী এক দশকে দক্ষিণ এশিয়ার উচ্চশিক্ষা মানচিত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান তৈরি করা সম্ভব হবে।

কডিএস সূচকে আলোকে শিক্ষক-ছাত্র অনুপাত কেবল একটি পরিসংখ্যানগত বিষয় নয়; বরং এটি উচ্চশিক্ষার গুণগত মান, গবেষণা সক্ষমতা এবং শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতীক। বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষা খাতে গত দুই দশকে ব্যাপক সম্প্রসারণ ঘটলেও সেই তুলনায় শিক্ষক নিয়োগ, গবেষণা অবকাঠামো এবং একাডেমিক মানোন্নয়ন পর্যাপ্তভাবে নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি। এর ফলে শিক্ষক-ছাত্র অনুপাতের ভারসাম্যহীন শিক্ষাদান, গবেষণা এবং আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে।

বর্তমান বাস্তবতায় শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ে সংখ্যা বৃদ্ধি নয়, বরং মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করাই হওয়া উচিত প্রধান লক্ষ্য। এজন্য প্রয়োজন মধ্যোত্তরিক শিক্ষক নিয়োগ, গবেষণায় বিনিয়োগ বৃদ্ধি, প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষাব্যবস্থা এবং দীর্ঘময়াদি জাতীয় উচ্চশিক্ষা পরিকল্পনা। একইসাথে সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় উভয় ক্ষেত্রেই গুণগত উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে যে দক্ষ শিক্ষক, গবেষণামুখী পরিবেশ এবং সুসম শিক্ষক-ছাত্র অনুপাত ছাড়া বিশ্বমানের বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলা সম্ভব নয়। তাই বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষাকে বৈশ্বিক মান উন্নীত করতে হলে এখনই পরিকল্পিত ও কার্যকর পদক্ষেপে গ্রহণ অপরিহার্য।

